S@ifur's BCS

৩৬তম লিখিত

সংবিধান- ০১

- ☑ সংবিধান প্রনয়নের ইতিহাস
- ☑ রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি
- ☑ মৌলিক অধিকার

- ❖ সংবিধান- সাধারণ বিষয়াবলী
- ❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

মোঃ মাহফুজুর রহমান

SMS : 01613 43 20 65

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

০২

BCS নিয়ে যে কোন পরামর্শ ও
অভিনন্দন দিয়ে Comment/Like করুন-
www.facebook.com/groups/saifurs.bcs.achievement

Scanned by CamScanner

BCS Syllabus on Bangladesh Affairs

❖ The Constitution of the People's Republic of Bangladesh: Preamble, Features, Directive Principles of State Policy, Constitutional Amendments.

BCS প্রশ্নাবলী — সংবিধান- ০১

☑ বাংলাদেশ সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা সংক্রান্ত ১২ ধারাটি লিখুন। (৩৫তম বিসিএস)

☑ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কোন সালের কোন তারিখ হতে কার্যকর হয়? এতে বিধৃত মৌলিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করুন এবং কি পরিস্থিতিতে এবং কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মৌলিক অধিকার সাময়িকভাবে স্থগিত করা যায়? (৩৪তম বিসিএস)

☑ সংবিধান কি? বাংলাদেশের সংবিধানের মূল ৪টি নীতি কি কি? বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে? মহামান্য রাষ্ট্রপতি কাদেরকে শপথ বাক্য পাঠ করান? মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে কোন কোন সংস্থার প্রধান? (৩৩তম বিসিএস)

☑ সংবিধান বলতে কি বুঝায়? (২৭তম বিসিএস)

☑ বাংলাদেশে সংবিধান প্রণয়ন সম্বন্ধে কি জানেন? ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানকে কেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়? (২৩তম বিসিএস)

☑ বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ কি কি? আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক নীতির বিস্তারিত আলোচনা করুন। (৩০তম বিসিএস)

☑ সংবিধানের কোন সংশোধনীর বলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণা করা হয়? মূল সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ কি ছিল? (৩০তম বিসিএস)

☑ "১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শাসনতন্ত্রের মূলনীতিসমূহে বাংলাদেশের ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ছিল" ব্যাখ্যা করুন। (২৫তম বিসিএস)

☑ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলতে কি বোঝায়? বিভিন্ন শাসনামলে এ ক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তনসমূহ পর্যালোচনা করুন। (২২তম বিসিএস)

Teacher's Discussion — সংবিধান- ০১

- ❒ সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস
- ❒ রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি
- ❒ মৌলিক অধিকার

Scanned by CamScanner

সংবিধান

সংবিধান : সংবিধান হল একটি রাষ্ট্রের দর্পণ বা প্রতিচ্ছবি। সংবিধান হল এমন এক বিশেষ দর্পণ যার মধ্যে একটি জাতির জীবন পদ্ধতি ফুটে উঠে। সাধারণত সংবিধান বলতে আমরা এমন কিছু নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান বা অনুশাসনকে বুঝি যা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলসূত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এটিকে বলা হয় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন বা দলিল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতামত :

এরিস্টটলের মতে-"A Constitution is the way of life the state has chosen for itself." আধুনিক মার্কিন সংবিধান বিশারদ ডাইসির মতে, "সকল প্রকার নিয়ম-কানুন যা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অনুশীলন বা ক্ষমতার বণ্টনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে তাকে সংবিধান বলে।"
মার্কিন সংবিধান বিশেষজ্ঞ লেসলি লিপসন তাঁর Democratic Civilization গ্রন্থে বলেন- "সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রশাসনগত নিয়ম-প্রণালী ও তার সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক সংবলিত একটি রাজনৈতিক প্রকল্প। বলা বাহুল্য, এই প্রকল্পের মূল কাঠামো হলো লিখিত সংবিধান।"
লর্ড ব্রাইস বলেন, "রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনার জন্য আইন রীতিনীতির সমষ্টিকেই সংবিধান বলে"।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান যে, সংবিধান হলো কতিপয় নিয়ম-কানুন যা সরকার গঠন, দেশ পরিচালনা, সরকার ও জনগণের অবস্থান নির্ণয় এবং সর্বোপরি পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূলসূত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সংবিধানের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের রূপ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। তাই সংবিধানকে বলা হয় 'রাষ্ট্রের দর্পণ'।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রণীত ১৯৭২ সালের সংবিধান সমগ্র জাতির জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। পাকিস্তান যেখানে তার পৃথক সংবিধান রচনা করতে প্রায় নয় বছর (১৯৪৭-১৯৫৬) এবং ভারত প্রায় তিন বছর (১৯৪৭-১৯৪৯) সময় নেয়, সেখানে বাংলাদেশ মাত্র নয় মাসে (এপ্রিল'৭২- ডিসেম্বর' ৭২) জাতিকে একটি সংবিধান উপহার দিতে সক্ষম হয়। দেশের প্রখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞ তৎকালীন সরকারের আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট "খসড়া সংবিধান প্রনয়ন কমিটি" বিভিন্ন মহলের ৯৮ টি সুপারিশের ভিত্তিতে ৭৪টি বৈঠকে ৩০০ ঘণ্টা সময়ে খসড়া সংবিধান প্রনয়ন করেন। তারপর সংসদে মুক্ত বিতর্কের মাধ্যমে ৪ নভেম্বর ১৯৭২ বিপুল ভোটাধিক্যে-এটি গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে তা কার্যকর হয়।
সংবিধান রচনার বিভিন্ন ধাপ নিম্নে বর্ণিত হলো-

ক) ১১ জানুয়ারী, ১৯৭২-এ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারি করেন। এ আদেশ অনুযায়ী একটি গণপরিষদ গঠিত হয়।
খ) ১৯৭০ এর নির্বাচনের জাতীয় পরিষদের (১৬৯ জন) ও প্রাদেশিক পরিষদের (৩০০) জন নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। পরবর্তীতে এর সদস্য সংখ্যা হয় ৪০৩ জন। এতে একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন বেগম রাজিয়া বানু।
গ) ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ। স্পীকার ছিলেন শাহ আব্দুল হামিদ এবং ডেপুটি স্পীকার ছিলেন মোহাম্মদ উল্লাহ। এই অধিবেশনে ডঃ কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট "খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি" গঠিত হয়।
ঘ) ৪ নভেম্বর ১৯৭২ খসড়া সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়।
ঙ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়।

সংবিধানের বৈশিষ্ট্য/ বাংলাদেশের সংবিধান বিশ্বের অন্যতম সংবিধান

১) প্রস্তাবনা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এর প্রস্তাবনা। এ প্রস্তাবনার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি একক স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র যা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত করানো হয়েছে।

২) রাষ্ট্রীয় মূলনীতি : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ম অনুচ্ছেদ-এ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ৪টি হচ্ছে- (ক) জাতীয়তাবাদ; (খ) সমাজতন্ত্র; (গ) গণতন্ত্র এবং (ঘ) ধর্মনিরপেক্ষতা।

Scanned by CamScanner

৩) **মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণ :** বাংলাদেশের সংবিধানের মাধ্যমে জনগনের মৌলিক অধিকার এর নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। যেমন- সাম্যের অধিকার, চলাফেরা, সভা-সমিতি, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা; সম্পত্তির অধিকার; ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক ও স্বাভাবিক মানবিক অধিকার গুলো এর অন্তর্ভুক্ত।

৪) **নাগরিকত্ব :** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন এমন নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এটি সংবিধানের ৬নং অনুচ্ছেদ দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

৫) **সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ও সংসদের প্রাধান্য :** বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা হয়েছে। সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রধানকে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান এবং মন্ত্রীপরিষদ এর নেতা প্রধানমন্ত্রী হবেন সরকার প্রধান। মন্ত্রীপরিষদ সদস্যগণ একক ও যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়বদ্ধ হবেন এমন বিধান লিপিবদ্ধ করে সংসদের প্রাধান্য এবং সংসদ সদস্যবৃন্দের জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করা হয়েছে। এমন বিধান বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশের সংবিধানকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

৬) **জনগণের সার্বভৌমত্ব :** বাংলাদেশের সংবিধানের মাধ্যমে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক করা হয়েছে জনগণকে এবং জনগনের পক্ষে সংবিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ক্ষমতার প্রয়োগ করবে এমন নির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে।

৭) **সংবিধানের প্রাধান্য :** বাংলাদেশের সংবিধানের মাধ্যমে সংবিধানকে সর্বোচ্চ আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাই সংবিধানের সাথে সঙ্গতিহীন যে কোন আইন বাতিল বলে গণ্য হবে। এছাড়াও সংবিধানের যেকোন ধারা সংশোধন বা রদবদলের জন্য পার্লামেন্টের দুই তৃতীয়াংশ সম্মতিসূচক প্রস্তাব বা ভোট গ্রহনের বিধান সংবিধানে রয়েছে।

৮) **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রদান :** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিধান হচ্ছে যে এই সংবিধানের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

৯) **নারীর ক্ষমতায়ন :** বাংলাদেশের সংবিধানের মাধ্যমে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহনের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন ৫০টিতে উন্নীত করা হয়েছে।

১০) **দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান :** বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনগত দিক থেকে দুস্পরিবর্তনীয়। একে পরিবর্তন করতে হলে দরকার শিরোনাম, সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদন।

১১) **সংসদ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ :** বাংলাদেশের সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা ও সরকারের স্থিতিশীলতার স্বার্থে সংসদে সদস্যপদ নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে বিধান করা হয় যে, কোন সংসদ সদস্য যদি তার নিজ দল হতে পদত্যাগ করে বা নিজ দলের বিপক্ষে সংসদে ভোট প্রদান করে তবে তার সংসদ সদস্য-পদ বাতিল বলে ঘোষিত হবে এবং পরবর্তী সংসদ নির্বাচনে অযোগ্য বলেয়া বিবেচিত হ বেন।

১২) **ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা :** বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ন্যায়পাল পদ সৃষ্টি ও তার ক্ষমতার ব্যাপারে বলা আছে। ন্যায়পাল যেকোন মন্ত্রণালয় ও সরকারী কর্মচারীর যেকোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত করতে পারবেন।

১২) **সর্বজনীন ভোটাধিকার :** বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী ন্যূনতম আঠারো বছরের উর্ধ্বে যেকোন বাংলাদেশী নাগরিককে ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা প্রাপ্ত করা হয়েছে। এক ব্যক্তি এক ভোট এ নীতিই বাংলাদেশের সংবিধানের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তি করা হয়েছে।

১৩) **প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল :** সাধারণ বিচার বিভাগ ছাড়া ও বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের কথা বলা হয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, বরখাস্ত, পদোন্নতি, দণ্ড ও কর্মের মেয়াদ, রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ ও সম্পত্তি পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহের উপর প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা আছে এই সংবিধানে। এ সমস্ত বিষয়ে সাধারণ আদালতসমূহের কোন এখতিয়ার থাকবে না। উল্লেখ্য ব্রিটেন, ভারত বা যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক উন্নত দেশে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের প্রচলন নেই।

১৪) **রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা :** সংবিধানের ৯৩ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ ভাঙিয়া যাওয়া অবস্থায় অথবা অধিবেশন স্থগিত কালে জরুরী প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করতে পারবেন যা আইনের মতে কার্যকরী হইবে। শর্ত থাকে যে, পরবর্তী অধিবেশনে তা অনুমোদন সাপেক্ষে আইনে পরিণত হবে অন্যথায় বাতিল হইবে।

১৫) **বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত দলিল :** বাংলাদেশের সংবিধান একটি বিস্তারিত লিখিত দলিল। সংবিধানটি ১১টি ভাগে বিভক্ত। এতে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ, একটি প্রস্তাবনা ও ৪টি তফসিল সন্নিবেশিত হয়েছে। ১৫টি সংশোধনী আইনে এই সংবিধান বিপুলভাবে পরিবর্তিত হলে তা কলেবরেও বৃদ্ধি পেয়েছে।

Scanned by CamScanner

১৬) **গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনা :** এই সংবিধানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে সুদৃঢ়ভাবে। সংবিধানের প্রথম অংশ (৭ অনুচ্ছেদে) বর্ণনা করা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'।

১৭) **এককেন্দ্রিক শাসন :** সংবিধানে বৃটেনের মতো বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। দেশের ক্ষুদ্র আয়তন এবং সামাজিক ঐক্যের ফলশ্রুতি হচ্ছে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা। এতে সকল ক্ষমতা একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। প্রদেশ বলে কোন কিছু থাকবে না বলে বলা হয়।

১৮) **এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা :** ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে দেশের জন্য এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিধান করা হয়েছে। ৩০০ জন নির্বাচিত ও ১৫ জন সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ মোট ৩১৫ জন সদস্য নিয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। পরে ১৫তম সংশোধনীতে সংরক্ষিত মহিলা আসন ৫০ জনে উন্নীত করায় সংসদের মোট সদস্য সংখ্যা হয়েছে ৩৫০ জন।

১৯) **শাসন ব্যবস্থার বিশদ বিবরণ :** এই সংবিধানে শাসন ব্যবস্থার কাঠামো, বিভিন্ন পদের শপথ, নির্বাচন পদ্ধতি, রাষ্ট্রভাষা, জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক প্রভৃতির স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

২০) **জাতীয় আদর্শ :** সংবিধানের প্রস্তাবনা বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শের কথা সগৌরবে ঘোষণা করছে। এটি একদিকে যেমন গণতন্ত্রের জয়গান করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখায়, অন্যদিকে তেমনি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণা করেছে। সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার প্রত্যেক সুসভ্য সমাজের ভিত্তিমুলস্বরূপ। তাই প্রস্তাবনার তৃতীয় অনুচ্ছেদে এসব রাষ্ট্রীয় আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে।

২১) **স্বাধীন বৈদেশিক নীতি :** সংবিধানের চতুর্থ অনুচ্ছেদে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্ভাব্য ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। 'স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি' লাভ করার ক্ষেত্রে তাই বাংলাদেশে উৎপীড়ন, অত্যাচার ও পাশব শক্তির বিরুদ্ধে সর্বদা প্রতিবাদী কণ্ঠ। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সংহতি রক্ষা করে আন্তর্জাতিক শক্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন ও সংহতিপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সদা সচেষ্ট রয়েছে।

২২) **নির্বাচন কমিশন ও কর্ম কমিশন :** সংবিধানে নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের বিধান করা হয়। সরকারী চাকুরীতে লোক নিয়োগের একটি স্বাধীন সরকারী কর্ম কমিশনের বিধানও সংবিধানে করা হয়।

২৩) **মালিকানার নীতি :** এই সংবিধানে বলা হয় যে, বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়, সমবায় ও ব্যক্তিগত এই তিন মালিকানা থাকবে। শেষোক্ত দুই ধরণের মালিকানা অবশ্য রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা সীমিত থাকবে।

২৪) **বাংলা পাঠের প্রাধান্য :** বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের ইংরেজি ও বাংলা পাঠের মধ্যে কোনো বিরোধ বা পার্থক্য দেখা দিলে বাংলা পাঠ বলবৎ থাকবে।

২৫) **মহিলা নাগরিকদের অবস্থান :** বাংলাদেশ সংবিধানে জাতীয় জীবনের সর্বত্র মহিলা নাগরিকদের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা রয়েছে। সংবিধানের ২৮ (১) ধারায় বলা হয়েছে 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।' ২৮ (২) ধারায় বলা হয়েছে 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন।' ৬৫ (৩) ধারায় নারীর জন্য জাতীয় সংসদের আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং এ ধারার অধীনে স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে'।

২৬) **জাতীয় সংসদকর্তৃক বিচারপতি অপসারণ :** প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে রাষ্ট্রপতির আদেশে বিচারপতিদের অপসারণ করা যাবে।

১৯৭২ সালের সংবিধান পুনর্বহাল- প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের মূল সংবিধানের চেতনায় ছিল মুক্তিযুদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ ও জনগনের অধিকার নিশ্চিত রাখা। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে মূল সংবিধানের চেতনাগুলো ধ্বংস করা হয়। তাই ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূল চেতনায় ফিরে যাবার দাবী উঠে এসেছে বারংবার। এর পক্ষে যুক্তিগুলো হলো :

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠিত হওয়া : মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল একটি শোষনমুক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ এবং মুক্ত ও উদার অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। কিন্তু সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা বিলুপ্ত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আঘাত করা হয়। তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমাদের ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করা : স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের সকল ধর্ম শ্রেণী- গোষ্ঠীর জনগণ অংশগ্রহণ করেছিল সকলের সম্মিলিত ত্যাগ ও প্রচেষ্টার ফসল হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশ। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের উদ্দেশ্যে ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সংবিধান সংশোধনের নামে বাংলাদেশের এ ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়টিকে বিতর্কিত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করার পাশাপাশি সংখ্যালঘু জনগণের মর্যাদা ও অবদানকে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। তাই নাগরিক হিসেবে সকল ধর্মের মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূল চেতনায় ফিরে যাওয়া উচিত।

Scanned by CamScanner

মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা : সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে জরুরী অবস্থা চলাকালীন সময়ে মৌলিক অধিকার স্থগিত করার বিধান সংযোজিত হওয়ায় জনগণের অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে। এটি বাংলাদেশের জনগনের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার পরিপন্থী। তাই জনগনের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ৭২ সালের সংবিধানের মূল চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

জাতীয়তার প্রশ্নে বিতর্কের অবসান : সংবিধানের ৬নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। প্রথম দিকে এ অগনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দরকারী বলে করা হলেও সাম্প্রতিক সময়ে এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। আর তাই এ বিতর্কের অবসান কল্পে ৭২ সালে রচিত সংবিধানের মূল চেতনায় ফিরে যাওয়ার কোন বিকল্প নেই।

প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সমন্বয় : দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। যার দরুন প্রধানমন্ত্রী সর্বময় ক্ষমতায় অধিকারী হন এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি কেবলমাত্র নামেই রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। এ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত হয়নি। আর তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে গণতন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তাই রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যেও ৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়া উচিত বলেই প্রতীয়মান হয়।

Teacher's Discussion

সংবিধানে মূলনীতি

০১। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানে বিধৃত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করুন। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনের প্রেক্ষিতে কি কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে? (৩২তম বিসিএস)

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (পঞ্চদশ সংশোধনীর আলোকে)

উত্তরঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংবিধানের অন্যতম অলংকার হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। যে কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হলো জনসাধারণকে সর্বাধিক নাগরিক সুবিধা প্রদান করো। সে কারণে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রের সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে সম্মিলিতভাবে বাস্তবায়ন করে গণতন্ত্রকে সফল করাই আধুনিক রাষ্টগুলোর প্রধান লক্ষ্য। এ কারণে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো তাদের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংযোজন করে আসছে। তবে রাষ্ট্রগুলো প্রয়োজনে এসকল নীতি ও অন্যান্য বিষয় সংবিধানে সন্নিবেশিত বা প্রয়োজনে সংশোধন করতে পারেন। যেমনটা সংশোধিত হয়েছে বাংলাদেশ সংবিধানে।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কি

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলতে আমরা সেসব নীতিকে বুঝি, যা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে সহায়তা করে। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিকে আবার কর্মসূচিগত অধিকারও বলা হয়। কারণ এগুলো সরকারের বিবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালনায় প্রেরণা যোগায়। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির সাংবিধানকি নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ মৌলিক অধিকারের মতো এগুলোকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি। মূলনীতিগুলোর বাস্তবায়ন নির্ভর করে একটি রাষ্ট্রের জাতীয় সম্পদ, জনগণের মেধা এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতার ওপর। সরকার এসব নীতি বাস্তবায়ন করে রাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণ সাধন করার জন্য। সরকার এসব ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখাতে না পারলে সরকারের বিরুদ্ধে এগুলো বাস্তবায়নের জন্য মামলা করা যাবে না, যেমনটি করা যায় মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সাধারণত সম্পদের অপর্যাপ্ততা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। সে কারণে সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বাস্তবায়নে চেষ্টা করে কিন্তু বাস্তবায়নের গ্যারান্টি দেয় না।

Scanned by CamScanner

১৯৭২ সালে সংবিধানে বিবৃত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহ

১৯৭২ সালের রচিত সংবিধানের উল্লেখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহকে কয়েকটি ধাপে আলোচনা করা হলো ঃ

❐ রাষ্ট্রের ৪টি মৌলিক আর্দশ সম্পর্কিত নীতি :

১. জাতীয়তাবাদ ঃ ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত একক সত্ত্বাবিশিষ্ট যে বাঙালি জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, সেই জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধতা বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। (অনুচ্ছেদ ৯)

২. সমাজতন্ত্র ঃ মানুষের ওপর মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত ন্যায়ানুগ সমাজ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলো রাষ্ট্রের লক্ষ্য। (অনুচ্ছেদ ১০)

৩. গণতন্ত্র ঃ বাংলাদেশ হবে একটি প্রজাতন্ত্র। এর রাজনৈতিক ব্যবস্থা হবে গণতান্ত্রিক। প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। (অনুচ্ছেদ ১১)

৪. ধর্মনিরপেক্ষতা ঃ ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ হলো সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার অবসান, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা না দেওয়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার না করা এবং ধর্মমের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বা নিপীড়নের অবসান। (অনুচ্ছেদ ১২)

❐ অর্থনৈতিক আদর্শ সম্পর্কিত নীতিসমূহ ঃ

➢ সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি ঃ সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের উপর মানুষের যে শোষণ তা থেকে মুক্ত করে ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। (অনুঃ ১০)

➢ কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি ঃ কৃষক, শ্রমিক এর অনগ্রসর জনগণকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। (অনুঃ ১৪)

➢ মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ঃ পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মের অধিকারসহ মৌলিক উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে। (অনুঃ ১৫)

➢ গ্রামীন উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব ঃ নগর ও গ্রামের জীবন যাত্রার মানের ক্রমাগত বৈষম্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে নিম্ন লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে-

(i) কৃষি বিপ্লবের বিকাশ ঘটাতে হবে
(ii) গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা করতে হবে
(iii) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে
(iv) কুটির শিল্প এবং অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে।

– (অনুঃ ১৬)

➢ অধিকার ও কর্তব্যরুপে কর্ম ঃ যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিককে কর্মের ব্যবস্থা হবে এটি হচ্ছে একজন নাগরিকের অধিকার আর রাষ্ট্র এটি ব্যবস্থা করবে এটি হচ্ছে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য। (অনু ২০)

❐ সামাজিক আদর্শ সম্পর্কিত নীতিসমূহ ঃ

➢ জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা ঃ জনগণের স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক দায়িত্ব হবে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যের জন্য হানিকর যেমন- মাদক, মদ, ক্ষতিকর ভেষজ সব কিছুর ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে রাষ্ট্র কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (অনুঃ ১৮)

➢ অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ঃ সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে, আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে হবে। (অনুঃ ১৭)

❐ আইন ও শাসন ব্যবস্থার সংস্কার মূলক নীতি ঃ

➢ নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ঃ রাষ্ট্রের আইন ও নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত থেকে বিচারে বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করবে। ১ নভেম্বর ২০০৭ থেকে এটি কার্যকর হয়েছে।

➢ জাতীয় সংস্কৃতি ঃ রাষ্ট্র জনগণের সংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (অনুঃ ২৩)

➢ জাতীয় স্মৃতি নিদর্শন ঃ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতি নিদর্শনের বিনাশ, বিকৃতি বা অপসারণ হইতে রাষ্ট্র রক্ষা করবে। (অনুঃ ২৪)

Scanned by CamScanner

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর প্রেক্ষিতে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে যেসব পরিবর্তন আনা হয়

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির চারটি মৌলিক আদর্শে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর নিজের ক্ষমতা দখল বৈধকরণের পাশাপাশি চারটি মৌলিক আদর্শের তিনটিতে পরিবর্তন আনেন। এ বিষয়ে তিনি চতুর্থ ফরমান জারি করেন, যা পঞ্চম সংশোধনীতে পাস করিয়ে নেয়া হয়। সংশোধন বা পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ :

❑ ৮(১)নং অনুচ্ছেদে পরিবর্তন ঃ

১. **জাতীয়তাবাদ ঃ** 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদ করা হয়। তবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধরন বা ভিত্তি কি হবে সংশোধনীতে তার কোনো উল্লেখ করা হয়নি। ফলে নতুন জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে বিতর্ক রয়ে যায়।

২. **সমাজতন্ত্রে ঃ** সমাজতন্ত্রেও পরিবর্তন আনা হয়। এতে বলা হয় সমাজতন্ত্রের স্থানে হবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার এই অর্থে সমাজতন্ত্র।

৩. **ধর্মনিরপেক্ষতা ঃ** 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' প্রতিস্থাপিত হয়।

❑ **১২নং অনুচ্ছেদে বিলুপ্ত ঃ** সংবিধানের ১২নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি বিলুপ্ত করা হয়।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর প্রেক্ষিতে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে যেসব পরিবর্তন আনা হয়

২০১১ সালের ৩০ জুন পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিতে নিম্ন লিখিত পরিবর্তন সাধিত হয় ঃ

❑ ৮(১)নং অনুচ্ছেদে পরিবর্তন ঃ

১. **জাতীয়তাবাদ ঃ** "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ" এর পরিবর্তে ১৯৭২ সালের সংবিধানে সন্নিবেশিত "বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ" ফিরিয়ে আনা হয়।

২. **সমাজতন্ত্র ঃ** "অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার এই অর্থে সমাজতন্ত্র" এটি পরিবর্তন করে ১৯৭২ সালের সন্নিবেশিত "সমাজতন্ত্র" প্রতিস্থাপন করা হয়।

৩. **ধর্মনিরপেক্ষতা ঃ** "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" পরিবর্তন করে ১৯৭২ সালের সন্নিবেশিত "ধর্মনিরপেক্ষতা" প্রতিস্থাপিত হয়।

❑ **৯নং অনুচ্ছেদে পরিবর্তন ঃ** 'স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন' এর পরিবর্তে জাতীয়তাবাদ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

❑ **১০নং অনুচ্ছেদে পরিবর্তন ঃ** 'জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ' এর স্থলে 'সামজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি' প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

❑ **১২নং অনুচ্ছেদ পূর্ণবহাল ঃ** পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বিলুপ্ত ১২নং অনুচ্ছেদটি পূণরায় বহাল করা অর্থাৎ বিলুপ্ত 'ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা' পূণরায় সংবিধানে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে রাষ্ট্রের দায়িত্বের পাশাপাশি নাগরিকদের কর্তব্যের কথাও বলা হয়েছে। যদিও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক এবং বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ধারণের সাথে সম্পৃক্ত, তবুও এগুলোকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি। কিন্তু একেবারে অবহেলাও করা হয়নি। জাতীয় সংসদকে এ মূলনীতিগুলো কার্যকর করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ৪৭ অনুচ্ছেদে চমৎকার ব্যাখ্যা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, কোনো সম্পত্তির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ বা দখল, খনি সম্পর্কিত অধিকার বিলোপ বা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে। তবে এই আইন প্রণয়ন বিষয়ে যদি উল্লেখ থাকে যে, তবে উক্ত আইন মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হলেও বাতিল হবে না। সুতরাং ৪৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইনসভাকে মূলনীতি কার্যকর করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এবং সকল ক্ষেত্রে মূলনীতির ওপর মৌলিক অধিকারের প্রাধান্য নেই।

বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতার বিবর্তন

ধর্ম নিরপেক্ষতা

ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে এমন বিষয়কে বোঝায় যা কোনো ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলতে ঐ মতবাদকে বুঝায় যেখানে বিশ্বাস করা হয় যে, মানুষের আইন, শিক্ষা, রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি তথা রাজনীতি হবে প্রকৃত তথা বাস্তব ঘটনা ও বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার ভিত্তিতে, ধর্মের ভিত্তিতে নয়। এ মতবাদ অনুযায়ী ধর্ম এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন থাকবে। ধর্ম ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকবে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মের কোনো সম্পৃক্ততা থাকবে না। তাছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে বস্তুবাদী দর্শনেরই ভিন্ন রূপ বলে মনে করা হয়। এতে বলা হয়, ব্যক্তির বস্তুগত স্বার্থ ও বিষয়াদিতে ধর্ম বা আদর্শগত বিষয়াদি সম্পৃক্ত থাকা অযৌক্তিক। তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতাও সীমিত করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে ব্যক্তির ধর্মীয় বিষয়াদির ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার থাকবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে আমরা বোঝাতে পারি এমন রাষ্ট্রকে যেখানে কোনো ধর্মীয় বিষয়, অবস্থান বা নিয়মনীতির সাথে রাষ্ট্রের কোনো দাপ্তরিক সম্পর্ক থাকবে না।

Scanned by CamScanner

১৯৭২ সালের সংবিধান ও ধর্ম নিরপেক্ষতা

একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র, যেখানে তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্মের ব্যবহার সীমিত করে একটি সর্বজনীন সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা গড়ে তোলা হবে- জনগণের এ প্রাণের দাবিকে পুঁজি করেই ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদসহ অন্যান্য নেতারা এবং পরবর্তীতে যুদ্ধ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা হবে নবগঠিত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মূল ভিত্তি। সে অনুযায়ী ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের যে নতুন সংবিধান রচিত হয় তার প্রস্তাবনায় বলা হয়, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উচ্চতর আদর্শ, যা স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের বীরজনতাকে আত্মোৎসর্গ করতে এবং আমাদের বীর শহীদদেরকে জীবন বিসর্জন দিতে প্রণোদিত করেছিল, তা-ই সংবিধানের মূলনীতি। আবার সংবিধানের ৮ (১) ধারায় বলা হয় যে, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি হবে রাষ্ট্রীয় নীতিমালার মূলনীতি। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে কার্যকর করার পন্থা হিসেবে বলা হয় যে, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিটি কার্যকর হবে-সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণের মাধ্যমে; খ) বিশেষ কোনো ধর্মকে রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো প্রকার বিশেষ মর্যাদা না দিয়ে; রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার রোধ করে এবং কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারীর প্রতি যে কোনো ধরনের বৈষম্যরোধের মাধ্যমে। এ উদ্দেশ্যে মূল সংবিধানে সকল প্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল যাতে ধর্মকে কোনো প্রকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা যায়। সংবিধানের ৩৮ ধারায় বলা হয়েছিল যে, কোনো সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোনো সংগঠন বা সংঘ যা কোনো ধর্মের নামে বা কোনো ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত হয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে লিপ্ত- এ ধরনের কোনো সংগঠন বা সংঘ গঠন বা এর সদস্য হওয়া বা এতে অংশগ্রহণের অধিকার কারো থাকবে না। এ ধারার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক সংগঠন– মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, নিজামে ইসলামকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

ধর্ম নিরপেক্ষতার ১ম বিবর্তন- পঞ্চম সংশোধনী

১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতিতে আনীত পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১) বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনার ওপরে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযোজন করা হয়।

২) সংবিধানের চারটি মূলনীতির মধ্যে অন্যতম ছিল 'ধর্মনিরপেক্ষতা' (Secularism)। এ মূলনীতিটিকে বিলুপ্ত করে তার স্থলে 'পরম করুণাময় আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' সংযুক্ত করা হয়। (অনুচ্ছেদ ৮)

ধর্ম নিরপেক্ষতার ২য় বিবর্তন- অষ্টম সংশোধনী

অষ্টম সংশোধনী বিল বাংলাদেশের চতুর্থ সংসদের পাস করা আইনগুলোর অন্যতম। ১৯৮২ সালে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে নির্ধারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালের ৯ জুন জাতীয় সংসদে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী পাস হয়। এ সংশোধনী অনুযায়ী সংবিধানে ২ (ক) ধারা সংযোজনের মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

ধর্ম নিরপেক্ষতার ৩য় বিবর্তন- পঞ্চদশ সংশোধনী

২০১১ সালে ১৫তম সংশোধনীতে ধর্ম নিরপেক্ষতার বিষয়ে আনীত পরিবর্তনসমূহ হলো-

১) **প্রস্তাবনা সংশোধন ঃ** সংবিধানের প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহির-রাহমানির রহিম' ও এর বাংলা অনুবাদ 'দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে'-এর পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে 'পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে' সংযোজনের পাশাপাশি প্রস্তাবনার প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কয়েকটি শব্দের সংশোধন করে মূল সংবিধানের শব্দসমূহ প্রতিস্থাপন করা হয়।

২) **রাষ্ট্রধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম এবং ধর্মের অপব্যবহার রোধ ঃ** সংবিধানের ২ক অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল রাখার পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের মর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়। অনুচ্ছেদ ১২-এ ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়টি পুনর্বহাল করার পাশাপাশি অনুচ্ছেদ ৩৮ সংশোধন করে ধর্মের অপব্যবহার রোধ করা হয়।

৩) **৭২-এর সংবিধানের মূলনীতি বহাল ঃ** সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি পরিবর্তন করে ৭২-এর সংবিধানের মূলনীতি পুনর্বহাল করা হয়। একই সাথে ৮ (১ক) দফায় উল্লেখিত 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি' বিলোপ করা হয়। পাশাপাশি ৯ ও ১০ নং অনুচ্ছেদে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন এবং জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ স্থলে যথাক্রমে জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্ত বিষয়গুলো প্রতিস্থাপন করা হয়। বিলুপ্ত ১২ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টিকে পুনর্বহাল করা হয়।

Scanned by CamScanner

BCS প্রশ্নাবলী — সংবিধানে মৌলিক অধিকার

- ☑ মৌলিক অধিকারসমূহ কিভাবে বলবৎযোগ্য? কখন এগুলো বলবৎযোগ্য নয়? (৩০তম বিসিএস)
- ☑ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কোন সালের কোন তারিখ হতে কার্যকর হয়? এতে বিধৃত মৌলিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করুন। (২৯তম বিসিএস)
- ☑ "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ"।- সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুসরণে ব্যাখ্যা করুন। (২৮তম বিসিএস)
- ☑ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন বলে মনে করেন? আলোচনা করুন। (২৮তম বিসিএস)
- ☑ কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি বলতে কি বোঝায়? সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুসরণে লিখুন। (২৮তম বিসিএস)
- ☑ গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব বলতে কি বোঝায়? সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে বর্ণিত মতে ব্যাখ্যা করুন। (২৮তম বিসিএস)
- ☑ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'- ব্যাখ্যা করুন। (২৭তম বিসিএস)
- ☑ বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকদের যেসব মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে তার একটি বিবরণ দিন। (২০তম বিসিএস)

Teacher's Discussion — সংবিধানে মৌলিক অধিকার

মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার

মৌলিক অধিকার ঃ মৌলিক অধিকার বলতে আমরা সেসব অধিকারকে বুঝি যা কোনো দেশের সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং যা বাস্তবায়নের ব্যাপারে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়। মৌলিক অধিকারগুলো সবই মানবাধিকার। তবে পার্থক্য এই যে, মানবাধিকারগুলোকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয় না। সুতরাং বলা যায় যে, যখন কতিপয় মানবাধিকারকে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করে তাদেরকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয় তখন এগুলোকে মৌলিক অধিকার বলে। সাংবিধানিক নিশ্চয়তা বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে, এসব অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত হলে সে ব্যক্তি আদালতের মাধ্যমে ঐ সব অধিকার ফিরে পাবে। আদালত তার রায়ের মাধ্যমে সরকারকে ঐ সব অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার হুকুম দিতে পারে।

মানবাধিকার ঃ মানুষ সমান মর্যাদা ও সমান অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং সকল মানুষই যে কোনো প্রকার পার্থক্য যেমন- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী-পুরুষ, ভাষা, জন্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতাদর্শ, জাতীয় ও সামাজিক উৎপত্তি জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে সমান এবং সকল ধরনের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী- এটিই মানবাধিকারের মূলকথা। ১২১৫ সালে রাজা জনের স্বাক্ষরিত 'The Magna Carta' বিশ্বের ইতিহাসের প্রথম মানবাধিকার সনদ। তবে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বশেষ ফসল এবং মানবজাতির গুরুত্বপূর্ণ সনদ 'The Universal Declaration of Human Rights' বা সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা। এই সনদটি ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয়।

মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্য ঃ মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

১) **সংবিধানে লিপিবদ্ধ ও নিশ্চয়তা অর্থে ঃ** সকল মৌলিক অধিকারই মানবাধিকার। কিন্তু সকল মানবাধিকার মৌলিক অধিকার নয়। মৌলিক অধিকারগুলো সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকে এবং কোনো কোনো মৌলিক অধিকারকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়। কিন্তু মানবাধিকার সংবিধানে ভিন্নভাবে লেখা থাকে না।

২) **উৎসগত পার্থক্য ঃ** মৌলিক অধিকারের উৎস মূলত কোনো দেশের সংবিধান। অর্থাৎ কোনো মানবাধিকার যখন সংবিধানে স্থান পায় তখন তাকে মৌলিক অধিকার বলে। অন্যদিকে মানবাধিকারের উৎস হলো আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন বিষয়।

৩) **অবস্থানগত পার্থক্য ঃ** মৌলিক অধিকারগুলো দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এক দেশের মৌলিক অধিকারের সাথে অন্য দেশের মৌলিক অধিকারের পার্থক্য থাকতে পারে। মানবাধিকারগুলো কোনো দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়ে আন্তর্জাতিকতা লাভ করে অর্থাৎ মানবাধিকারকে ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ রাখা যায় না।

৪) **সাংবিধানিক নিশ্চয়তা অর্থে ঃ** মৌলিক অধিকারকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়। অর্থাৎ, কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে আদালত তার মৌলিক অধিকার বলবৎ করতে পারে। পক্ষান্তরে, মানবাধিকারগুলোর কোনো সাংবিধানিক নিশ্চয়তা নেই অর্থাৎ এগুলো আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়।

৫) **প্রযোজ্যতা ক্ষেত্রে ঃ** মৌলিক অধিকারগুলো একটি নির্দিষ্ট দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে মানবাধিকারগুলো সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের নাগরকিদের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

Scanned by CamScanner

বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার সমূহ

বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৭ অনুচ্ছেদ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। সংবিধান প্রণেতাগণ শুধু বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্যই মৌলিক অধিকার প্রণয়ন করেননি, বরং বাংলাদেশে বিদেশী নাগরিকদের ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ ধারা সংযোজন করেছেন। মৌলিক অধিকার মোট ১৮ টি।

ক. শুধু বাংলাদেশের নাগরিকরা ভোগ করতে পারে এমন মৌলিক অধিকার ১২ টি।

১) **আইনের দৃষ্টিতে সমতা ঃ** সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। এই অনুচ্ছেদকে ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়, সকল ব্যক্তিই আইন দ্বারা সমভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে, কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। সমপর্যায়ভুক্ত সকল ব্যক্তির প্রতি আইন সমান আচরণ করবে এবং সকলকে সমভাবে রক্ষা করবে। তবে ব্যক্তির কার্য ও দায়িত্বের ভিন্নতা থাকতে পারে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর কর্তব্য এবং অধিকার ভিন্ন হতে পারে। (অনুচ্ছেদ ২৭)

২) **ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ বৈষম্য করা যাবে না ঃ** ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না এবং উক্ত কারণে নাগরিককে সাধারণ বিনোদন ও বিশ্রাম কেন্দ্রে কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ বা ভর্তি হতে বঞ্চিত করা যাবে না। রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে। তবে নারী, শিশু ও অনগ্রসর নাগরিকদের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। (অনুচ্ছেদ ২৮)

৩) **চাকরির সমান সুযোগ ঃ** প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ থাকবে। আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদের মধ্যে রাষ্ট্রের চাকরিতে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করা যাবে না। (অনুচ্ছেদ ২৯)

৪) **বিদেশী রাষ্ট্রের উপাধি গ্রহণ ঃ** রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হতে কোন খেতাব, সম্মান, পুরষ্কার বা ভূষণ গ্রহণ করবে না (অনুচ্ছেদ-৩০)।

৫) **আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার ঃ** বাংলাদেশে অবস্থানরত সকল ব্যক্তি কেবল আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হবে এবং আইনের বিধি ছাড়া কারো জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি করা যাবে না। (অনুচ্ছেদ ৩১)

৬) **চলাফেরার স্বাধীনতা ঃ** সকল নাগরিক বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধে চলাফেরা করতে পারবে। নাগরিকরা যে কোনো স্থানে বসবাস করতে পারবে এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও এ দেশে পুনঃপ্রবেশ করতে পারবে। এতে অবশ্য কিছুটা ব্যতিক্রমও আছে। সেটা হলো সরকার জনস্বার্থে চলাফেরার স্বাধীনতার ওপর যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারবে। (অনুচ্ছেদ ৩৬)

৭) **সমাবেশের স্বাধীনতা ঃ** জনশৃঙ্খলা বা জনস্বার্থের জন্য আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে বা নিরব অবস্থায় সমবেত হবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। (অনুচ্ছেদ ৩৭)

৮) **সংগঠনের স্বাধীনতা ঃ** জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংগঠন করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। (অনুচ্ছেদ ৩৮)

৯) **বাক-স্বাধীনতা ঃ** সকলের চিন্তা ও বিবেকের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। এ অনুচ্ছেদে বাক-স্বাধীনতা ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে। তাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে রাষ্ট্র আইনের দ্বারা যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারবে। (অনুচ্ছেদ ৩৯)

১০) **পেশা ও বৃত্তির অধিকার ঃ** যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিক আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে যে কোনো আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করতে পারবে এবং যে কোনো আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারবে। (অনুচ্ছেদ ৪০)

১১) **ধর্মীয় স্বাধীনতা ঃ** ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, আইনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার থাকবে। প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার থাকবে। (অনুচ্ছেদ ৪১)

১২) **গৃহ ও যোগাযোগ রক্ষণ ঃ** প্রত্যেক নাগরিকের স্বীয় গৃহে নিরাপত্তা লাভের অধিকার থাকবে। এ অনুচ্ছেদের অর্থ দাঁড়ায় কারো গৃহে প্রবেশ করা, তল্লাশি করা এবং কাউকে আটক করা চলবে না। এছাড়া চিঠিপত্রের এবং যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমে গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা বা জনস্বার্থের জন্য আইনের দ্বারা যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করা যাবে। (অনুচ্ছেদ ৪৩)

Scanned by CamScanner

খ. বাংলাদেশে বসবাসকারী নাগরিক ও বিদেশীরা ভোগ করতে পারে এমন মৌলিক অধিকার ৬টি। যথা–

১৩) **জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার ঃ** বাংলাদেশে বসবাসরত সকল নাগরিক ও বিদেশী কেবলমাত্র আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হবে। আইনের ধারা ব্যতীত কারো জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। (অনুচ্ছেদ ৩২)

১৪) **গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ ঃ** কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের কারণ না জানিয়ে আটক রাখা যাবে না, কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করতে হবে এবং আদালতের আদেশ ছাড়া তাকে আটক রাখা যাবে না। অবশ্য সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীতে বলা হয়, সরকার বিনা বিচারে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আটক রাখতে পারবে। অবশ্য বিদেশী শত্রুর এই অধিকার প্রযোজ্য নয়। (অনুচ্ছেদ ৩৩)

১৫) **জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ ঃ** সকল প্রকার জবরদস্তিমূলক শ্রম নিষিদ্ধ। তবে ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য এই বিধি কার্যকর নয়। রাষ্ট্র জনগণের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলক শ্রমের বিধান করতে পারবে। (অনুচ্ছেদ ৩৪)

১৬) **বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে বিধান ঃ** এ ধারায় বলা হয়েছে, যে সময়ে কোনো কার্য সংঘটিত হয়েছে সে সময়ে প্রচলিত আইনের বিধান লঙ্ঘন করা না হলে ঐ কার্যের জন্য কাউকেও দোষী করা যাবে না। এক অপরাধের জন্য এক ব্যক্তিকে একাধিকবার অভিযুক্ত করা যাবে না। ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার লাভের অধিকারী। কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে বাধ্য করা যাবে না। কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেয়া যাবে না বা নিষ্ঠুর ও অমানুষিক দণ্ড দেয়া যাবে না। {অনুচ্ছেদ ৩৫ (১) (২) (৩) (৪) (৫)}

১৭) **ধর্মীয় স্বাধীনতা ঃ** আইন-শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিককে যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রয়েছে এবং প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রয়েছে। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোনো ছাত্রকে নিজস্ব ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হবে না। (অনুচ্ছেদ ৪১)

১৮) **সাংবিধানিক প্রতিকার পাওয়ার অধিকার ঃ** মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য যে কোনো ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে মামলা রুজু করতে পারে (অনুচ্ছেদ ৪৪)। সুপ্রিম কোর্ট কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে কোনো মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ বা নির্দেশ দান করতে পারবে (অনুচ্ছেদ ১০২)। রাষ্ট্র মৌলিক অধিকারসমূহ লঙ্ঘন করে কোনো আইন প্রণয়ন করবে না। (অনুচ্ছেদ ২৬)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'- ব্যাখ্যা :

সংবিধান হলো বিশ্বের সকল স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষভাবে অপরিহার্য একটি দলিল। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ঐ বছরের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পর অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান দ্বারা সদ্য স্বাধীন দেশ পরিচালনাকারী রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের স্থায়ী সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' জারি করেন। ১১ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে গণপরিষদ ড. কামাল হোসেনকে প্রধান করে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে দেয়। এ কমিটি ৭৪টি অধিবেশনে মিলিত হয়ে প্রায় ৩০০ ঘন্টা আলোচনার পর সংবিধানের খসড়া গণপরিষদে ১২ অক্টোবর ১৯৭২ উত্থাপন করে, ৪ নভেম্বর ১৯৭২ খসড়া সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সংবিধান কার্যকর হয়। এ সংবিধানের মোট ১১টি ভাগের তৃতীয় ভাগে ২২টি অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়। এ অনুচ্ছেদগুলোতে ১৮টি মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত করা হয়- যার একটি হচ্ছে 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'।

আইনের দৃষ্টিতে সমান :

আইন হলো এমন কতকগুলো নিয়মকানুন বা বিধিবিধানের সমষ্টি যা জনসাধারণের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের সকল আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সকলের জন্যই সমানভাবে প্রয়োগ করা যায়। আইনের দৃষ্টিতে সমতা বলতে বোঝায়, কোনো ব্যক্তিই আইনের উর্ধ্বে নয়। আইনের চোখে সকলেই সমান। ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও অবস্থা নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি দেশের সাধারণ আইনের অধীন এবং সাধারণ আদালতের নিকট সকলকেই দায়িত্বশীল থাকতে হয়। আইনের চোখে সাধারণ নাগরিক এবং কর্মচারীদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। আইন সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। আইনে কেউ কোনো বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত হবে না। শাসক ও শাসিত একই আইনের অধীনে থাকবে। শাসকের জন্য কোন আলাদা আইন থাকবে না। আর সংবিধান হবে দেশের সাধারণ আইনের মূল উৎস। সংবিধানে থাকবে নাগরিক অদিকারসমূহের পূর্ণ নিশ্চয়তা। সংবিধানের আইনের ভিত্তি হবে জনগনের পূর্ণ সম্মতি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নয়, বরং রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সকল ব্যক্তিই সমান বলে বিবেচিত হবে। রাষ্ট্রের কোন নাগরিক আপন প্রভাবে আইনের উর্ধ্বে উঠতে পারবে না, কোনো নাগরিকই আইনের চোখে নিম্নতর বলে বিবেচিত হবে না।

Scanned by CamScanner

আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী : এটা বলতে বোঝায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি কোনরূপ বৈষম্য করা যাবে না, এমনকি অধিকার আদায় বা ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রেও। কোনো নাগরিক যদি মনে করে রাষ্ট্র বা ব্যক্তি তার অধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা বা জটিলতা সৃষ্টি করছে, তার ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করছে, সেক্ষেত্রে তার অধিকার আদায়ে তিনি আইনের শরণাপন্ন হতে পারেন এবং আইনের মাধ্যমে তার অধিকার ফিরে পেতে পারেন- যদি তা ন্যায়সঙ্গত হয়। এক্ষেত্রে আদালত তথা বিচার বিভাগ ধনী-গরিব বিবেচনায় কাউকে প্রাধান্য দিবে না বা কারো প্রতি অবমাননাকর কোনো আচরণ করবে না। এক্ষেত্রে আদালতের কাজ আইনী প্রক্রিয়ায় সত্য উদঘাটন করে মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে শাস্তি বিধান করা এবং সত্যের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া। বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক ব্যক্তির আইনের আশ্রয় লাভ ও আইন অনুযায়ী ব্যবহার লাভের অধিকার রয়েছে। কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে এমন বিষয়ে আইনের বিধান ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না।

সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার সম্পর্কিত ব্যাখ্যা :

ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ বা জন্মগত কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করা যাবে না। এসব কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে বা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনো রূপ বাধা বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে না। বাংলাদেশ সংবিধানে স্পষ্টভাবে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভের কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে- নারী, শিশু বা অনগ্রসর নাগরিকদের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ বিধান করতে পারবে।

রাষ্ট্রে কর্মসংস্থান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ থাকবে। ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থান নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক এক্ষেত্রে সুযোগের সমতা উপভোগ করবে। তবে অনগ্রসর অংশের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের জন্য বা কোনো ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠান তাদের যথার্থ নিয়োগ সংরক্ষণের জন্য বা বিশেষ কোনো কর্মের জন্য নারী বা পুরুষের পক্ষে তা অনুপযোগী এবং এজন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

রাষ্ট্রপ্রধানের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কোনো নাগরিক বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট থেকে কোনো উপাধি বা সম্মান লাভ করতে পারবে না।

কোনো গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন না করে প্রহরায় আটক রাখা যাবে না এবং তাকে তার মনোনীত আইনজীবীর সাথে পরামর্শের ও আত্মপক্ষের সমর্থনের অধিকার দেয়া হবে। গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে আদালতে হাজির করতে হবে এবং আদালতের আদেশ ব্যতীত তাকে এর বেশি আটক রাখা যাবে না। তবে এ বিধান কোনো বিদেশী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

সকল প্রকার জবরদস্তিমূলক শ্রম নিষিদ্ধ ও আইনত দন্ডনীয়। অবশ্য কোনো ব্যক্তি ফৌজদারি অপরাধের জন্য আইনত দন্ড ভোগকালে বাধ্যতামূলক শ্রম করলে বা জনগণের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা তা প্রয়োজনীয় হলে তা দূষণীয় হবে না।

প্রচলিত আইন ভঙ্গ করার অপরাধ ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না এবং অপরাধ সংঘটনকালে বলবৎ আইনে যে শাস্তি দেয়া যেতে পারত, তার অধিক শাস্তি তাকে দেয়া যাবে না। এক অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারিতে সোপর্দ ও দন্ডিত করা যাবে না। ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারের সুযোগ লাভ করবে। তাছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না। কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেয়া যাবে না বা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা লাঞ্ছনাকর কোনো শাস্তি দেয়া যাবে না। তবে আইনের দ্বারা সেসব শাস্তি প্রবর্তিত হলে তা অন্য কথা।

জনস্বার্থ আইন দ্বারা আরোপিত যুক্তসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা এবং যে কোনো স্থানে বসতি স্থাপন করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে অইনগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে যে কোনো নাগরিক শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হতে পারবে এবং যে কোনো জনসভা বা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহন করতে পারবে।

জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। তবে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাম্প্রদায়িক সমিতি বা ধর্মভিত্তিক কোনো সমিতি গঠন করতে পারবে না বা সদস্য হয়ে তৎপরতা গ্রহণ করতে পারবে না, যা রাষ্ট্রীয় মূলনীতিবিরোধী।

প্রত্যেক নাগরিক চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা লাভ করবে এবং প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা মানহানি বা আদালত অবমাননার ক্ষেত্রে আইন আরোপিত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে সেসব অধিকার যুক্তিসঙ্গতভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে।

Scanned by CamScanner

রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক যে কোনো আইনানুগ পেশা অবলম্বন ও আইনসঙ্গতভাবে কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারবে। আইন-শৃঙ্খলা, নৈতিকতা সাপেক্ষে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক স্বীয় ধর্মমত পোষণ করতে পারবে। স্বীয় ধর্মচর্চা, উপাসনা, অনুষ্ঠানাদি পালন করতে পারবে এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করতে পারবে। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত কাউকে তার ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের শিক্ষা গ্রহণ করতে বা অন্য ধর্মের আচার অনুষ্ঠানে যোগদান করতে বাধ্য করা যাবে না।

আইনগতভাবে প্রত্যেক নাগরিক তার সম্পত্তি অর্জন, ধারণ এবং হস্তান্তর করতে পারবে এবং আইনের নির্দেশ ব্যতীত কোনো নাগরিককে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত শর্তসাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিক প্রবেশ, তল্লাশি ও আইন হতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তা লাভের অধিকার ভোগ করবে এবং চিঠিপত্র ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ে গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার লাভ করবে।

কোনো নাগরিকের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হলে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা যাবে বা আইনগতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য আদালতেও আবেদন করা যাবে। ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সংবিধান সংশোধন আদেশ অনুযায়ী মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের ৪২তম অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় ধারা সংশোধন করে ঘোষণা করা হয় যে, সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও সম্পত্তি দখলের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে।

বাংলাদেশ সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিককে অইনের চোখে সমতা এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার প্রদান করে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য এবং সুবিচারের নিশ্চয়তা থাকবে। জনগণকে সকল ক্ষমতার মালিক বলে উল্লেখ করে মানবসত্ত্বার মর্যাদা এবং মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।

'রাষ্ট্রের পছন্দকৃত জীবন পদ্ধতিই সংবিধান'- বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীর আলোকে উক্তিটির ব্যাখ্যা :

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্র গঠিত হয়। আবার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বলতে বোঝায় সুশৃঙ্খল সমাজ জীবনের প্রতিষ্ঠা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তথা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি শাসকগোষ্ঠী থাকে। এ শাসকগোষ্ঠী হলো সরকার। প্রচলিত অর্থে একটি দেশে সরকার বলতে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে বোঝায়। সরকারের এ বিভাগগুলোর মধ্যে ক্ষমতার বন্টন কিভাবে হবে, কিভাবে সরকারি কাজ পরিচালিত হবে এবং রাষ্ট্রাধীন ব্যক্তিসমূহের সাথে সরকারের কি সম্পর্ক হবে ইত্যাদি বিষয়ে কতগুলো নিয়কানুন থাকে। এই নিয়মকানুনগুলোই হলো সংবিধান। সংবিধান বা শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে। সংবিধানের বিধানকে টপকিয়ে কোনো কাজ করার ক্ষমতা সরকারের থাকে না। এজন্য সংবিধানকে রাষ্ট্র পরিচালনার চাবিকাঠি বলা যায়।

সংবিধান সংশোধনী : পৃথিবীর কোনো নিয়মই স্বতঃসিদ্ধ বা চিরন্তন নয়। আজ যার প্রয়োজন আছে, কাল তার প্রয়োজন নাও থাকতে পারে। মানুষের প্রয়োজনেই বিভিন্ন নিয়মকানুনের আবির্ভাব। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে কতিপয় নিয়ম অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং প্রয়োজন হয়ে পড়ে নতুন নিয়ম প্রবর্তনের। সে প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের মৌলিক দলিল তথা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সৃষ্ট সংবিধান ও সংশোধনীর প্রয়োজন হয়। যুগে যুগে দেশে দেশে রাষ্ট্রসমূহ জনগণের কল্যাণে নানা সময়ে সংবিধানের সংশোধনী এনেছে। কাজেই সংক্ষেপে সংবিধান সংশোধনী বলতে বোঝায়, জনগণের কল্যাণে সময়ের প্রয়োজনে প্রচলিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অপ্রয়োজনীয় নিয়মকানুনকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন করে নতুন আইনের বা নিয়মকানুনের প্রবর্তন করাকে। বাংলাদেশের সংবিধানে এ পর্যন্ত মোট ১৬ বার সংশোধনী আনা হয়েছে। যার কিছু রাজনৈতিক ও কিছু প্রশাসনিক প্রয়োজনে সংশোধন করা হয়েছে।

রাষ্ট্রের পছন্দকৃত জীবন পদ্ধতিই সংবিধান : সংবিধান হলো বিশ্বের সকল স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষভাবে অপরিহার্য একটি দলিল। সংবিধানবিহীন রাষ্ট্র কর্ণধারবিহীন জাহাজের সাথে তুলনীয়। কারণ সংবিধানের ভিত্তিতেই একটি রাষ্ট্র পরিচালিত হয়,সরকার গঠিত হয়, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বন্টিত হয়, সরকারি কাজকর্ম পরিচালিত হয় এবং ব্যক্তি ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপিত হয়। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাই যথার্থই বলেছেন, 'Constitution is the way of life the state has chosen for itself'.

সংবিধান হলো লিখিত বা অলিখিত মৌলিক নিয়মাবলীর সমষ্টি যা কোনো রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহারের ও বন্টনের নীতি নির্ধারণ করে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করে। কোনো রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি কিরূপ তা সংবিধান থেকেই অবহিত হওয়া যায়। তাই সংবিধানকে রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি বলেও অভিহিত করা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেলিনেকের মতে, 'সংবিধান রাষ্ট্রের বিভাগসমূহ নির্ধারণ করে, তাদের গঠন-প্রনালী এবং পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করে, কাজের সীমারেখা চিহ্নিত করে এবং সর্বশেষ রাষ্ট্রের সাথে উক্ত বিভাগ বা শাখাসমূহের কি সম্বন্ধ হবে তাও স্থির করে।'

Scanned by CamScanner

অধ্যাপক কে.সি. হুয়ার বলেন, সংবিধান হলো সেসব নিয়ম, যার দ্বারা কি উদ্দেশ্যে এবং কোন বিভাগের দ্বারা সরকারি ক্ষমতা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে তা লিপিবদ্ধ থাকে। আধুনিককালে প্রত্যেক সংবিধানে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলো কি হবে এবং তা রক্ষা করার উপায় কি তাও বর্ণনা করা থাকে। সুতরাং এদিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় যে, সংবিধান সরকারের ক্ষমতা নির্ধারণ করে, শাসিতের অধিকার এবং এ দুয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করে।

সংবিধানের বিধান ও নীতি অবশ্যই পরিষ্কার ও সহজ ভাষায় থাকে। এসব বিধান ও নীতির অর্থ সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট হয়। সংবিধানে থাকে সমগ্র শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিধি বিধানের উল্লেখ। সংবিধান জনগণের পরিবর্তনশীল চাহিদা ও আশা- আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

সংবিধানের বিধান অধিকাংশই স্থায়ী ও স্থিতিশীল হয়ে থাকে। সংবিধানের মূলনীতি রাষ্ট্রীয় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তৈরি করা হয়। সে কারণে এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থায়ী হয়ে থাকে। জনগণের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতির নিশ্চয়তা থাকে সংবিধানে। ফলে সরকার ব্যক্তির কোনো অধিকার লঙ্ঘন করলে সে আদালতে তার প্রতিকার চাইতে পারে। ব্যক্তি আদালতে ন্যায়বিচারের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে পারে।

সংবিধানে সার্বভৌম ক্ষমতা সঙ্গতিপূর্ণ উপায়ে বন্টন করা হয়। সরকার আইনগত সার্বভৌমত্বের অধিকারী। আর জনগণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। প্রতিটি জাতির কিছু আশা-আকাঙ্খা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। আর সংবিধানে জাতির আশা-আকাঙ্কা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শের, সন্নিবেশ থাকে। ফলে সরকার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে জাতির স্বপ্নপূরণে কাজ করতে পারে। ফলে জনগণও লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের দিকে অগ্রগামী হয়। কারণ জনগণ একে তাদের ধ্যান ধারণার সাথে সাঞ্জস্যপূর্ণ মনে করে।

সংবিধান জনমতের ধারক ও বাহক। কারণ সংবিধানে জনমতের প্রতিফলন ঘটে। জনমতের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সংবিধান পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, সংযোজিত, বিয়োজিত হয়ে যুগোপযোগী হয়। সংবিধান সার্বভৌম ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করে। রাষ্ট্রের আইনগত সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ সরকার এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ জনগণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে সংবিধান।

সংবিধানের প্রাধান্য সুনিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগের প্রাধান্য নিশ্চিত করা হয়। এজন্য বিচার বিভাগের হাতে সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। বিচার বিভাগ সংবিধানের অভিভাবক। যেমন- বাংলাদেশ সংবিধানে সুপ্রিম কোর্টকে এ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সংসদ কোনো আইন পাস করলে তা যদি সংবিধানের বিধানাবলীর সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হয় তবে তাকে বাতিল ঘোষণা করতে পারে। যেমন- ৫ম সংবিধান সংশোধনী আদালত অবৈধ বলে রায় দেয়।

বাংলাদেশ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে দীর্ঘ নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পরই ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটির দ্বারা সংবিধান প্রণয়ন ও তা কার্যকর করে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২। কিন্তু প্রথম সংবিধানে এদেশের যুদ্ধপরাধীদের বিচারে কোনো বিধান না থাকায় ১৫ জুলাই ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধে লিপ্ত বন্দি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের বিচারের ক্ষমতার বিধান করা হয়।

দীর্ঘ ২৩ বছরের পাকিস্তানি শাসনামলে জরুরি অবস্থার অহরহ অপব্যবহার করা হয়েছে যার তিক্ত অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতাগণকে সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করে যে, বাংলাদেশের সংবিধানে জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত কোনো বিধান রাখা হবে না। কিন্তু সংবিধান প্রণয়নের পর বছর যেতে না যেতেই দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জরুরি অবস্থার বিধান সংযোজিত হয় নবম-ক ভাগে ১৪১ ক, ১৪১খ, ১৪১গ অনুচ্ছেদে। ১৪১ ক অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা তার কোনো অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন, তাহলে তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন।'

বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী আনা হয় একটি বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে। ১৬ মে, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিতে ১৫টি স্থানে বাংলাদেশের সীমানা রদবদল করা হয়। এ জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন ছিল (চুক্তিকে কার্যকর করতে)। এ চুক্তি অনুয়ায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্ধারণ করা হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানে এ পর্যন্ত যতগুলো সংশোধনী আনা হয়েছে তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, বিতর্কিত এবং সুদূরপ্রসারী ছিল চতুর্থ সংশোধনী। যে সরকার স্বাধীনতার পর দেশ ও জাতিকে একটি উন্নত সংবিধান উপহার দিয়েছিল সে সরকারই মাত্র দু বছর পর ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি তথাকথিত রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু করে, অভিশংসনের জটিলতা সৃষ্টি করে, সংসদকে অথর্ব ও ক্ষমতাহীন বিভাগে পরিণত করে, হাইকোর্টের মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করে, একদলীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে সংবিধানকে কাঁচিকাটা করে ধূলিসাৎ করে।

পঞ্চম-একাদশ সংশোধনীতে সংবিধানকে সামরিক আইনের সাপেক্ষ ও অধীনে রাখা হয় এবং বিভিন্ন আদেশের মাধ্যমে সংবিধানকে সামরিক সরকারের ইচ্ছামতো পরিবর্তন করা হয়েছে। সাংবিধানিকভাবে এবং আইনগত দিক দিয়ে এসব পরিবর্তন ও সংশোধন সম্পূর্ণ অবৈধ। কারণ সংবিধান সংশোধন করতে পারে কেবল সংসদ। সামরিক প্রশাসক বা সামরিক আইন চলাকালে কার্যরত রাষ্ট্রপতির সংবিধান সংশোধন করার কোনো ক্ষমতা থাকে না; যদি না সংবিধানে বিপরীত মর্মে কিছু বলা থাকে। কিন্তু এসব পরিবর্তনের বৈধতা সম্পর্কে পরবর্তীতে কেউ যেন কোনো প্রশ্ন না তুলতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা করে অধ্যাদেশ দ্বারা মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়।

Scanned by CamScanner

দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয় এবং রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা নির্ধারণ করা হয়। ত্রয়োদশ সংশোধনীতে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় এবং এজন্য সংবিধানে অতিরিক্ত অনুচ্ছেদ ৫৮ক, খ, গ, ঘ, ঙ সংযোজিত হয়। চতুর্দশ সংশোধনীতে কতিপয় সাংবিধানিক পদের অবসরের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়, প্রতিকৃতি সংরক্ষণের বিধান প্রবর্তন করা হয়, নারী সংরক্ষিত আসন ৩০ থেকে ৪৫-এ উন্নীত করা হয়, অর্থ বিলে সংশোধনী আনা হয়।

পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনা, মূলনীতি ও নির্বাচন ব্যবস্থা ও তফসিলসহ ৫৫টি ধারায় ব্যাপক ও মৌলিক পরিবর্তনের বিধান সংযোজন করা হয়।

ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতিদের অভিশংসন বা অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর অর্পন করা হয়।

কাজেই উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, সংবিধানকে রাষ্ট্রের পছন্দকৃত জীবন পদ্ধতি বলা হলেও বাংলাদেশের সংবিধানে সংশোধনীগুলোর অধিকাংশই ছিল ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতাকে সুসংহত করতে তথা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। দু তিনটি সংশোধনী ছাড়া অধিকাংশ সংশোধনীতে যেসব বিধান সংযোজিত হয়েছে তাতে জনগণের লাভবান হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

কোনো সংবিধানই চূড়ান্ত ও চিরন্তন নয়। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সংবিধানেরও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটতে বাধ্য। লর্ড ব্রুহামের ভাষায় বলা যায়, উপযোগী হতে হলে সংবিধানের পক্ষে সম্প্রসারণশীল হতে হবে। অথবা সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের ভাষায় বলা যায় যে, সকল জীবন্ত রাষ্ট্রনৈতিক সংবিধানই বিবর্তনশীল। সংবিধানের মাধ্যমেই একটি দেশ, রাষ্ট্র ও জাতির পরিচয় লাভ করা যায়। এর মাধ্যমেই জাতির স্বকীয়তা ও মৌলিকত্ব ফুটে ওঠে । বাংলাদেশের সংবিধানে যেসব সংশোধনী আনা হয়েছে তার অধিকাংশই শাসকবর্গের প্রয়োজনে– জনকল্যাণে নয়। কাজেই ভবিষ্যতে সংবিধান সংশোধনী আনলে জনগনের কল্যাণকেই অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

Student Work | সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা সংক্রান্ত ১২ ধারা :

সংবিধানে চার মূলনীতির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা হলো অন্যতম। ১৯৭২ সালের সংবিধানের এই ধারাটি 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নামেই পরিচিত ছিল। মাঝপথে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এই ধারাটি 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' নামে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। সর্বশেষ ৩ জুলাই ২০১১ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত করার সাথে সংবিধানের এই ধারাটিকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা' নামে রূপ দেয়ায় বাহাত্তরের সংবিধানের মূল চেতনা পুনরুজ্জীবিত হয়। নিচে সংবিধানের এই মূলনীতি বিষয়ক অনুচ্ছেদটি উল্লেখ করা হলো :

অনুচ্ছেদ ১২ : ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা-
ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য

ক. সর্বপ্রকারের সাম্প্রদায়িকতা,
খ. রাষ্ট্র দ্বারা কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,
গ. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,
ঘ. কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যাক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হবে।

ধর্মনিরপেক্ষতা :

ধর্মনিরপেক্ষতা মূলত ইউরোপীয় রেনেসাঁর ফলে সৃষ্ট একটি মতবাদ। এ মতবাদে ধর্মকে সকল বৈশ্বিক বিষয় থেকে আলাদা রাখার কথা বলা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে এমন বিষয়কে বোঝায় যা কোনো ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলতে ঐ মতবাদকে বুঝায় যেখানে বিশ্বাস করা হয় যে, মানুষের আইন, শিক্ষা, রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি তথা রাজনীতি হবে প্রকৃত তথা বাস্তব ঘটনা ও বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার ভিত্তিতে, ধর্মের ভিত্তিতে নয়। এ মতবাদ অনুযায়ী ধর্ম এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন থাকবে। ধর্ম ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকবে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মের কোনো সম্পৃক্ততা থাকবে না। তাছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে বস্তুবাদী দর্শনেরই ভিন্ন রূপ বলে মনে করা হয়।

Scanned by CamScanner

একে বলা হয়, ব্যক্তির মনুষ্যগত স্বার্থ ও বিষয়াদিতে ধর্ম বা আধ্যাত্মিক বিষয়াদি সম্পৃক্ত থাকা অযৌক্তিক। তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতাও সীমিত করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে ব্যক্তির ধর্মীয় বিষয়াদির ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার থাকবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে আমরা বোঝাতে পারি এমন রাষ্ট্রকে যেখানে কোনো ধর্মীয় বিষয়, অনুষ্ঠান বা নিয়মনীতির সাথে রাষ্ট্রের কোনো আন্তরিক সম্পর্ক থাকবে না।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উদ্দেশ্য হলো মনুষ্যগত উপাদান এবং মনুষ্যবাদী নীতি ও পদ্ধতির সাহায্যে মানব জীবনকে উন্নত করা। এ মতবাদের কেন্দ্রবিন্দু সম্পূর্ণ বৈষয়িক এবং এখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু দৃশ্যমান এবং মানবীয় অনুভূতির আওতাধীন তা-ই বিবেচনাযোগ্য। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে কেবল ঐ জাতীয় জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস রাখা হয় যা ঐশ্বরিক নয়, যা অভিজ্ঞতা ও যুক্তিধারা এবং যাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই করা যায়। এখানে ঐশ্বরিক কোনো কিছুরই স্থান নেই।

তবে আধুনিককালে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে অনেক ক্ষেত্রে ভিন্নতর রূপে দেখা যায়। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রবক্তারা বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মীয় মতবাদ থেকে ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে কোনো অত্যাবশ্যকীয় বিরোধ নেই। কেননা শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম পালনের সাথে সেক্যুলারিজমের কোনো বিরোধ নেই। তাদের দৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান না করা এবং রাষ্ট্রে সকল ধর্মের সমমর্যাদায় অবস্থান নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি :

বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংবিধান লাভ করেছে। সংবিধান লাভের চারটি প্রধান পদ্ধতি আছে, যথা: মঞ্জুরি, সুপরিকল্পিত রচনা, ক্রমবিবর্তন ও বিপ্লব। উল্লেখিত চারটি পদ্ধতির কোনোটিই বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে প্রযোজ্য নয়। বাংলাদেশে সংবিধান প্রতিষ্ঠা পদ্ধতির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ একটি নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙালি জনগণের স্বার্থ ও নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই জনপ্রতিনিধিগণ যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করেন। সুতরাং যুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তির পর সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে বাংলাদেশকে কোন বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। স্বাধীনতা লাভের পর নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ একটি গণপরিষদ গঠন করে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করেন। অতএব এ পদ্ধতিকে বিপ্লব ও সুপরিকল্পিত রচনার সংমিশ্রণ বলা যেতে পারে।

বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক ধারণার সুপ্রচলনের ফলে সংবিধানের প্রণয়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। বর্তমানে বিশ্বে রাজনীতিই তার জঠর থেকে সংবিধানকে জন্ম দেয়, একে লালিত-পালিত করে এবং আইনগত ক্ষমতা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে। সংবিধান থেকেই উৎসারিত হয় অন্য সকল আইন।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস : স্বাধীন বাংলাদেশে প্রণীত ১৯৭২ সালের সংবিধান সমগ্র জাতির জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। পাকিস্তান যেখানে তার পৃথক সংবিধান রচনা করতে প্রায় নয় বছর এবং তারও প্রায় তিন বছর অতিক্রান্ত হয়, সেখানে বাংলাদেশ মাত্র নয় মাসে জাতিকে একটি সংবিধান উপহার দিতে সক্ষম হয়। দেশের প্রখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞ তৎকালীন সরকারের আইন ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' বিভিন্ন মহলের ৯৮টি সুপারিশের ভিত্তিতে ৭৪টি বৈঠকে ৩০০ ঘণ্টা সময়ে সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করেন। তারপর সংসদে মুক্ত বিতর্কের মাধ্যমে ৪ নভেম্বর ১৯৭২ বিপুল ভোটের ব্যবধানে এটি গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ থেকে তা কার্যকর হয়।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া : স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই সংবিধান রচনার কাজ শুরু হয়। ১১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারি করেন। সে আদেশ অনুযায়ী ১৯৭০-এর নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যগণ গণপরিষদের সদস্য হন। আর ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ জারি করেন। তারপর ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করা হয় এবং তৎকালীন আইনমন্ত্রী কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয় ১১ এপ্রিল ১৯৭২ সালে। তারপর ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে বসে এবং সে দিনই ড. কামাল হোসেন খসড়া শাসনতন্ত্রটি অধিবেশনে উপস্থাপন করেন। তারপর এর ওপর আলোচনা শুরু হয়। অবশেষে ৪ নভেম্বর খসড়াটি পরিষদে গৃহীত হয়। ১৪ ডিসেম্বর পরিষদ অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৭২ সালের পর থেকে বাংলাদেশের সংবিধানে এ পর্যন্ত ১৬টি সংশোধনী হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতির বাধ্যবাধকতা :

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ৪ ক। অনুচ্ছেদে জাতির পিতার সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ঐ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে।

বাংলাদেশ সংবিধানের মূল চার নীতি :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ৮ম অনুচ্ছেদ থেকে ২৫তম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা রয়েছে। জাতীয়তাবাদ,সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা-এ চারটি বিষয়কে রাষ্ট্রের মৌলস্তম্ভ বা মৌলিক আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এতে আরো বলা হয় যে, অন্যান্য মৌলিক নীতিগুলো উপর্যুক্ত চারটি আদর্শ থেকে উৎসারিত হবে। নিচে চারটি মৌলিক আদর্শ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো :

১. জাতীয়তাবাদ : ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, সেই জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধতা বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

২. সমাজতন্ত্র : মানুষের ওপর মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত ন্যায়ানুগ সমাজ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলো রাষ্ট্রের লক্ষ্য।

৩. গণতন্ত্র : বাংলাদেশ হবে একটি প্রজাতন্ত্র। এর রাজনৈতিক ব্যবস্থা হবে গণতান্ত্রিক। প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

৪. ধর্মনিরপেক্ষতা : ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ হলো সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার অবসান, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা না দেয়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার না করা এবং ধর্মের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বা নিপীড়নের অবসান।

সংবিধানে উল্লিখিত নারী অধিকার :

বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন–

সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় উল্লেখ রয়েছে : 'জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবেন।' এছাড়াও-

১. সংবিধানের ২৭ ধারায় উল্লেখ রয়েছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।'

২. ২৮ (১) ধারায় রয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবেন না।'

৩. ২৮(২) ধারায় আছে, 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন।'

৪. ২৮ (৩) ধারায় আছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।'

৫. ২৮ (৪) ধারায় উল্লেখ আছে, 'নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন থেকে এ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না'।

৬. ২৯(১) ধারায় রয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।'

৭. ২৯ (২) এ আছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হবেন না কিংবা সেক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।'

৮. ৬৫ (৩) ধারায় নারীর জন্য সংসদে আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং এ ধারার অধীনে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

"প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগন।"- সংবিধানের অনুচ্ছেদ অনুসরণে ব্যাখ্যা :

সংবিধান হলো বিশ্বের সকল স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষভাবে অপরিহার্য একটি দলিল। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংবিধানে রাষ্ট্রের সকল নিয়ম-নীতি সংক্ষেপে উল্লেখ থাকে। ঠিক তেমনি ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর কার্যকরকৃত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে বাংলাদেশকে একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে সংবিধানের প্রথম ভাগের ৭(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।" প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। আইন পরিষদের সদস্যরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। তারা তাদের সকল কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। তাদের সকল কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। আর এ জবাবদিহিতা হয় ভোটের মাধ্যমে। জনগণ যাকে ভোট দিয়ে তার প্রতিনিধি বানায়, সে প্রতিনিধি যদি জনগণের আশা-আকাঙ্খা বা চাহিদা পূরণ করতে না পারে বা ব্যর্থ হয় তাহলে পরবর্তী নির্বাচনে জনগণ তাকে আর ভোট দিবে না। আর এভাবেই জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণ হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের চরম বা চূড়ান্ত ক্ষমতার মালিক তাছাড়া সত্যিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণকে সরকারি অধিকাংশ কাজের ব্যাপারে অবহিত করা হয়, জনগণের মতামত গ্রহণ করা হয় রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনে গণভোটের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে এরূপ গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল- যা পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া সরকার তার কাজের জন্য জবাবদিহি করে থাকে, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। সরকার চরম স্বৈরাচার বা একনায়ক হলে সরকারকে জনগণ আন্দোলনের মাধ্যমে পতন ঘটায় অথবা একটি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হবার পর সরকার পদত্যাগ করে।

Scanned by CamScanner

কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি :

সংবিধান হলো একটি রাষ্ট্রের দর্পণস্বরূপ। সংবিধানে থাকে রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম-কানুন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে ১৪ অনুচ্ছেদে 'কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি' শিরোনামে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে মেহনতী মানুষকে ও কৃষক শ্রমিকের এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমুহকে সকল প্রকার শোষণ হতে মুক্তি দান করা।" কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল ৮০ ভাগ লোক। কৃষি খাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। ২০১৪–১৫ অর্থবছরের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ছিল ১৫.৯৬ শতাংশ। দেশের মোট শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৩০ শতাংশ কৃষি খাতে নিয়োজিত। (শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৪-১৫, বিবিএস)। উক্ত অর্থবছরে (২০১৪-১৫) বিস্তৃত কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি আয় ছিল মোট রপ্তানি আয়ের ৪.৫ শতাংশ। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বহুলাংশে কৃষিখাতে উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল। কৃষির অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বিধায় কৃষিখাতের উন্নয়নে কৃষকের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব থেকে মুক্তির জন্য সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কৃষিখাতের সর্বাধিক উন্নতি সাধনের জন্য জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, জাতীয় বীজ নীতি এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নীতি কার্যকর রয়েছে। এছাড়া জাতীয় কৃষি নীতি' ৯৯ সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষির আধুনিকায়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং কৃষি গবেষণার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কৃষি উন্নয়নে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও কৃষকদের রয়েছে বহুবিধ সমস্যা। যেমন- সেচ সমস্যা, ঋণ সমস্যা, জলাবদ্ধতা সমস্যা, কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ সমস্যা, উন্নত বীজ সরবরাহ সমস্যা, মূলধনী সমস্যা প্রভৃতি বিদ্যমান। কাজেই কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি বলতে যে ব্যবস্থাকে বলা হয়েছে প্রকৃত অর্থে এখনো বাংলাদেশে তা সম্ভব হয়নি।

গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব :

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অর্জন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান উপহার দেয়া। ১৯৭২ সালে প্রবর্তিত সংবিধানের ১৫৩ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ ৮ থেকে ২৫ অনুচ্ছেদে সংযোজন করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬ অনুচ্ছেদের 'গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব' শিরোনামে বলা হয়েছে, "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" শিরোনামে বলা 'গ্রামীণ উন্নয়ন' বলতে গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন তথা রাস্তা-ঘাট, সেতু, হাসপাতাল, দালানকোঠা, ঘরবাড়ি, পানি ও শক্তি সম্পদ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করাকে বোঝায়। অপরদিকে, 'কৃষি বিপ্লব' বলতে কৃষিক্ষেত্রে উন্নত বীজ ও সার সরবরাহ, ভূমি চাষে উন্নত ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, নদী ভাঙন রোধ, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, কৃষির যথাযথ মুল্য নির্ধারণ, সঠিক কৃষিনীতি ঘোষণা ও ভূমির সঠিক মালিকানা নির্ধারণ প্রভৃতি ব্যবস্থাকে বোঝায়।

গণ পরিষদ

নতুন সংবিধান রচনা বা প্রণয়নের প্রস্তাব করার লক্ষে নির্বাচিত প্রতিনিধিমূলক সংস্থাকে বলা হয় গণপরিষদ। বাংলাদেশের জন্য একটি স্থায়ী সংবিধান রচনার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ "বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ" নামে একটি আদেশ জারি করেন। পরে ১৯৭২ সালের ৭ এপ্রিল "বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ (সংশোধনী) নামে একটি আদেশ জারি করেন। এ অধ্যাদেশে বলা হয় কেন্দ্রীয় ১৬৯ আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের সদস্যদের নিয়ে কেন্দ্রীয় ১৬৯ আসন এবং প্রাদেশিক ৩০০ আসনের সদস্যদের নিয়ে "বাংলাদেশ গণপরিষদ" গঠিত হবে। এই আদেশ আনুসারে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ পর্যন্তসাবেক পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের আসনসমূহে বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত সকল সদস্যের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা ৪৬৯ জন হলেও শেষ পর্যন্তএসংখ্যা দাঁড়ায় ৪০৩ জনে। ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন প্রথম অধিবেশন বলে। এর প্রথম স্পিকার ও ডেপুটি স্পীকার ছিলেন যথাক্রমে শাহ আব্দুল হামিদ ও মোহাম্মাদ উল্লাহ। এই গণপরিষদই বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়ন করে।

Scanned by CamScanner

সার্বভৌমত্ব

রাষ্ট্রের চরম ও চূড়ান্তক্ষমতাকে সার্বভৌমত্ব বলে। ফরাসি দার্শনিক জাঁ বোঁদা-এর মতে, 'আইনের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত নাগরিক ও প্রজাদের ওপর রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতাই হচ্ছে সার্বভৌমত্ব।' বিশিষ্ট আইনজ্ঞ জন অস্টিন-এর মতে, যদি কোনো নির্দিষ্ট উর্ধ্বতন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি অপর কোনো উর্ধ্বতনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করে সেই সমাজের বেশিরভাগ লোকের স্বভাবজাত আনুগত্য লাভ করে, তখন সেই নির্দিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সেই সমাজের সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের অধিকারী এবং উক্ত সমাজ একটি রাজনৈতিক ও স্বাধীন সমাজ।' রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হব্‌স বলেন, 'সার্বভৌম ক্ষমতা হলো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির সেই ক্ষমতা, যা যুদ্ধের অবস্থা থেকে শান্তি ও শৃঙ্খলার অবস্থায় পৌছার জন্য মানুষ পারস্পরিক চুক্তি করে পদাধিকারীর হাতে তুলে দিয়েছে।' রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রুশোর মতে, 'সার্বভৌম ক্ষমতা হলো সেই চরম ক্ষমতা, যা সামাজিক চুক্তি বা রাজার সর্বগ্রাসী ক্ষমতা নয়। এ ক্ষমতা গণইচ্ছার প্রকাশ। এ ক্ষমতা অবিভাজ্য, অহস্তান্তরযোগ্য ও অজ্ঞাত।' সুতরাং সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রের চূড়ান্ত, স্থায়ী, অবিভাজ্য, অহস্তান্তরযোগ্য এবং সর্বজনীন ক্ষমতা। এ ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র তার অধীন সকলকে আদেশ ও নির্দেশ দান করে এবং সকলের নিকট থেকে আনুগত্য লাভ করে। অন্যভাবে বলা যায়, সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রের সেই চূড়ান্তক্ষমতা যার গুণে রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বজায় রাখে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অপর রাষ্ট্র থেকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকে।

নাগরিকত্ব

নাগরিক হলো একটি রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা, যারা রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে তারাই নাগরিক। নাগরিকদের সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে এবং অনুরূপভাবে রাষ্ট্রেরও নাগরিকদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৬ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। এবং ৬ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন।

প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ- ব্যাখ্যা

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর কার্যকরকৃত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে বাংলাদেশকে একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে সংবিধানের প্রথম ভাগের ৭ (১) অনুচ্ছেদে 'সংবিধানের প্রাধান্য' শিরোনামে বলা হয়েছে "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।" প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভোটে নির্বাচিত হন। আইন পরিষদের সদস্যরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। তারা তাদের সকল কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। তাদের সকল কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। আর এ জবাবদিহিতা হয় ভোটের মাধ্যমে। জনগণ যাকে ভোট দিয়ে তার প্রতিনিধি বানায়, সে প্রতিনিধি যদি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা চাহিদা পূরণ করতে না পারে বা ব্যর্থ হয় তাহলে পরবর্তী নির্বাচনে জনগণ তাকে আর ভোট দিবে না। আর এভাবেই জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণ হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের চরম বা চূড়ান্তক্ষমতার মালিক। তাছাড়া সত্যিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণকে সরকারি অধিকাংশ কাজের ব্যাপারে অবহিত করা হয়, জনগণের মতামত গ্রহণ করা হয় রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনে গণভোটের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে এরূপ গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। সরকার তার কাজের জন্য জবাবদিহি করে থাকে, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। সরকার চরম স্বৈরাচার বা একনায়ক হলে সরকারকে জনগণ আন্দোলনের মাধ্যমে পতন ঘটায় অথবা একটি নির্দিষ্ট সময় (৫ বছর) অতিক্রান্তহবার পর সরকার পদত্যাগ করে।

কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে ১৪ অনুচ্ছেদে 'কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি' শিরোনামে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে কৃষক ও শ্রমিকে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।" কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল ৮০ ভাগ লোক। কৃষি খাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বহুলাংশে কৃষিখাতে উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল। কৃষির অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বিধায় কৃষিখাতের উন্নয়নে কৃষকের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব থেকে মুক্তির জন্য সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

মৌলিক চাহিদা

সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়–

ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;
খ) কর্মের অধিকার;
গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং
ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার।

Scanned by CamScanner

গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব

১৯৭২ সালে প্রবর্তিত সংবিধানের ১৫৩ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ ৮ থেকে ২৫ অনুচ্ছেদে সংযোজন করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬ অনুচ্ছেদে 'গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব' শিরোনামে বলা হয়েছে, "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

'গ্রামীন উন্নয়ন' বলতে গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন তথা রাস্তা-ঘাট, সেতু, হাসপাতাল, দালানকোঠা, ঘরবাড়ি, পানি ও শক্তিসম্পদ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করাকে বোঝায়। অপরদিকে, 'কৃষি বিপ্লব' বলতে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নত বীজ ও সার সরবরাহ, ভূমি চাষে উন্নত ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, নদী ভাঙন রোধ, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন, কৃষির যথাযথ মূল্য নির্ধারণ, সঠিক কৃষিনীতি ঘোষণা ও ভূমির সঠিক মালিকানা নির্ধারণ প্রভৃতি ব্যবস্থাকে বোঝায়।

সুযোগের সমতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৯নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবেন।

২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সংবিধানের আলোকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি

সংবিধান ২৫ (ক), (খ), ও (গ) অনুচ্ছেদে পররাষ্ট্রীতি সম্পর্কে দি নির্দেশনা দেয়া আছে। সেখানে বলা আছে- রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি হবে–

- জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা
- অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় সমূহে হস্তক্ষেপ না করা
- আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান
- আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা

এ সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র –

- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করবে।
- প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারন ও গঠনের অধিকার সমর্থন করবে।
- সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্য বাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করবে।

পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ঃ ১) আত্মরক্ষা, ২) অর্থনৈতিক অগগতি, ৩) অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় নিজের জাতীয় শক্তিকে রক্ষা এবং প্রয়োজন বোধে বৃদ্ধি করা, ৪) নিজস্ব মতবাদে দৃঢ় থাকা, ৫) জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করা, ৬) জোট নিরপেক্ষতা এবং ৭) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা গত তিন দশক ধরে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ঃ

০১) জাতিসংঘের সনদ ও নীতিমালা, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, সকল জাতির সার্বভৌমত্ব ও সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান নীতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধতা।

০২) জাতিসংঘ, EEC, EU, ASEAN, OPEC, OIC, GEC, আরব লীগ, কমনওয়েলথ প্রভৃতির সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন।

০৩) বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করা ।

০৪) জোট নিরপেক্ষতা ।

০৫) সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়।

০৬) অর্থনৈতিক কূটনীতির (Economic Diplomecy) ওপর গুরুত্বারোপ।

Scanned by CamScanner

নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী- ব্যাখ্যা

বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৭ অনুচ্ছেদ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। সংবিধান প্রণেতাগণ শুধু বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্যই মৌলিক অধিকার প্রণয়ন করেননি, বরং বাংলাদেশে বিদেশী নাগরিকদের ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ ধারা সংযোজন করেছেন। মৌলিক অধিকার মোট ১৮ টি। এর মধ্যে ২৭ নং অনুচ্ছেদেদে রয়েছে- 'আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'।

আইনের দৃষ্টিতে সমান ঃ আইন হলো এমন কতকগুলো নিয়মকানুন বা বিধিবিধানের সমষ্টি যা জনসাধারণের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য, রাষ্ট্রের সকলের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সকলের জন্যই সমানভাবে প্রয়োগ করা যায়। আইনের দৃষ্টিতে সমতা বলতে বোঝায়, কোনো ব্যক্তিই আইনের উর্ধ্বে নয়। আইনের চোখে সকলেই সমান। ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও অবস্থা নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি দেশের সাধারণ আইনের অধীন এবং সাধারণ আদালতের নিকট সকলকেই দায়িত্বশীল থাকতে হয়। আইনের চোখে সাধারণ নাগরিক এবং সরকারি কর্মচারীদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। আইন সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী ঃ জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি কোনোরূপ বৈষম্য করা যাবে না, এমনকি অধিকার আদায় বা ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রেও। কোনো নাগরিক যদি মনে করে রাষ্ট্র বা ব্যক্তি তার অধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা বা জটিলতা সৃষ্টি করছে, তার ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করছে, সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি তার অধিকার আদায়ে আইনের শরণাপন্ন হতে পারে এবং আইনের মাধ্যমে তার অধিকার ফিরে পেতে পারে- যদি তা ন্যায়সঙ্গত হয়। এক্ষেত্রে আদালত তথা বিচার বিভাগ ধনী-গরীব বিবেচনায় কাউকে প্রাধান্য দিবে না বা কারো প্রতি অবমাননাকর কোনো আচরণ করবে না।

গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ

৩৩ নং অনুচ্ছেদে গ্রেফতারকৃত নাগরিককে মৌলিক রক্ষাকবচের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে-কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের কারণ না জানিয়ে আটক রাখা যাবে না, কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করতে হবে এবং আদালতের আদেশ ছাড়া তাকে আটক রাখা যাবে না। অবশ্য সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীতে বলা হয়, সরকার বিনা বিচারে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আটক রাখতে পারবে। অবশ্য বিদেশী শত্রুর এই অধিকার প্রযোজ্য নয়।

ধর্মীয় স্বাধীনতা

ধর্মীয় স্বাধীনতা বলতে এমন নীতিকে বোঝায়, যা কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায় সরকারি বা বেসরকারিভাবে তার ধর্মীয় কার্যক্রম ও বিশ্বাস, শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করে। ধর্মীয় স্বাধীনতা ধারণাটি ধর্ম পরিবর্তন করা অথবা কোনো ধর্মের অনুসারী না হওয়ার সাথেও সংশ্লিষ্ট। বাংলাদেশ সংবিধানের ৪১(১) (ক) তে বলা হয়েছে, প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রয়েছে, (খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানুষের চিন্তা-চেতনার নতুন নতুন ধারা উন্মোচন হওয়ার ফলে আধুনিক উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে।

জনশৃঙ্খলা রক্ষা

আভিধানিক অর্থে 'শৃঙ্খলা' বলতে শিকল, জিঞ্জির, নিগড়, রীতি, নিয়ম, বিন্যাস, সুব্যবস্থা, ধারা প্রভৃতিকে বোঝায়। আর জনশৃঙ্খলা রক্ষা বলতে জনগণের নিরাপত্তা রক্ষা নিয়ম, রীতি, ধারা প্রভৃতি পালন বা রক্ষা করতে বাধ্য করা বা সাহায্য করাকে বোঝায়। আর এ কর্মপ্রচেষ্টা বা দায়িত্ব পালন করে রাষ্ট্রে নিয়োজিত শৃঙ্খলাবাহিনী ও বিভিন্ন প্রকার প্রশাসনিক কর্মীবৃন্দ। যাতে কোন প্রকার অপরাধ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রভৃতি সংগঠিত না হতে পারে, স্বাভাবিক জনজীবন বিঘ্নিত না হতে পারে তার জন্যে এরা নিরলস কাজ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষ শান্তিপূর্ণভাবেও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হবার এবং জনসভা বা শোভাযাত্রায় যোগদান করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। ৩৯ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হলো।

Scanned by CamScanner

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

বাংলাদেশে সরকার ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সেনা বাহিনী ও তাদের দেশীয় দোসর- রাআকার আল বদর, আল শামস্ এর দ্বারা সংগঠিত যুদ্ধাপরাধের বিচার করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে ৯ জুলাই জাতীয় সংসদে ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্টের সংশোধনী আনায়ন করে এবং ২৫ মার্চ ২০১০ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল, তদন্তসংস্থা ও আইনজীবী প্যানেল গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট, ১৯৭৩ এর ১৯ এর ৬ নং সেকশনের ক্ষমতাবলে সরকার বিচারপতি মোঃ নিজামুল হকের নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই জন সদস্য হলেন বিচারপতি এটি এম ফজলে কবীর ও অবসর প্রাপ্ত জেলা জজ এ কে এম জহির আহমেদ। ৭ সদস্য বিশিষ্ট তদন্তসংস্থার নেতৃত্ব দিবেন সাবেক আতিরিক্ত সচিব আব্দুল মতিন এবং রাজশাহী মহানগর আদালতের পি পি অ্যাডভোকেট গোলাম আরিফ টিপুর নেতৃত্বে আইনজীবী প্যানেল গঠন করা হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল- এর তদন্তকারী দল প্রাথমিকভাবে ১৬০০ জন যুদ্ধাপরাধীর তালিকা প্রনয়ন করেছে। ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে পলাতক আবুল কালাম আজাদ (বাচ্চু রাজাকারের ফাঁসির রায়ের মাধ্যমে রায় প্রদান শুরু হয়। ইতোমধ্যে ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্কাইপিতে সংলাপের জেরে বিতর্কের জন্ম দেয় এবং একজন বিচারপতি পদত্যাগ করেন।

জাতীয় সংস্কৃতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৩নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ 'রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, যাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিশালীতে অবদান রাখবার ও অংশগ্রহণ করবার সুযোগ লাভ করতে পারেন।'

সম্পত্তির অধিকার

বাংলাদেশের সংবিধানের ৪২নং অনুচ্ছেদে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

০১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাবে না।

০২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে; তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হয়েছে বলে সে আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

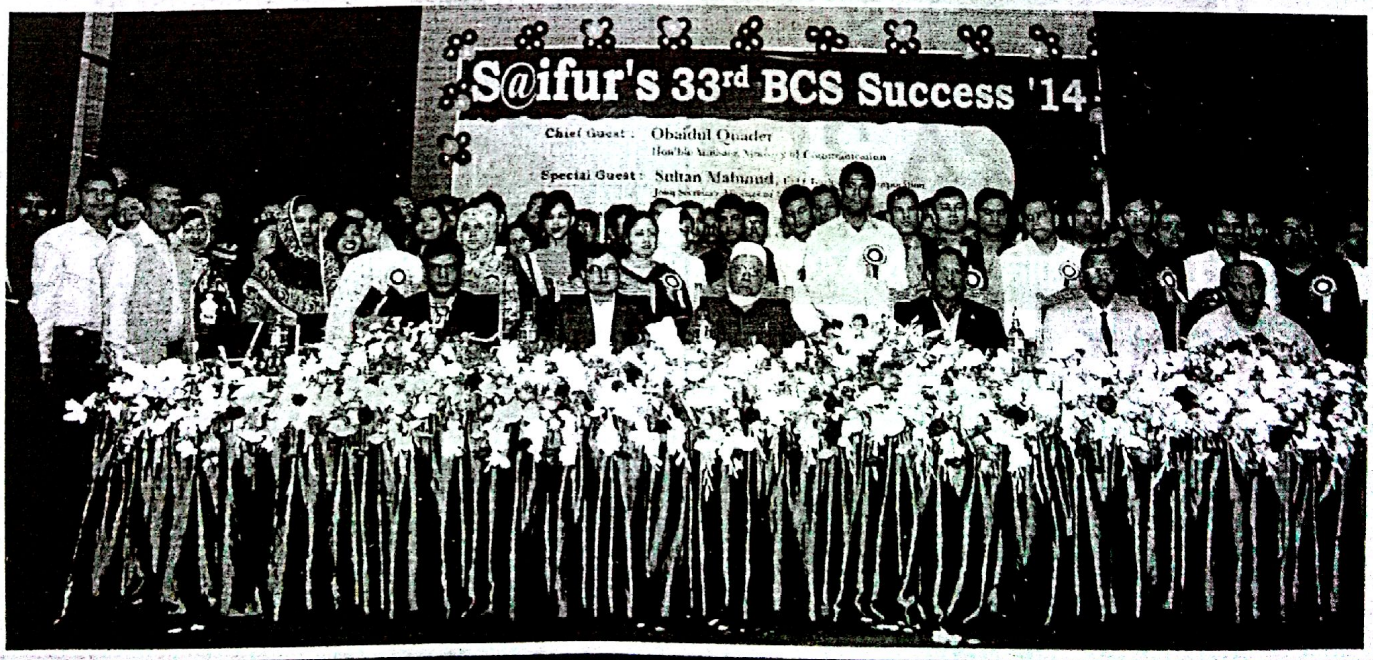

Scanned by CamScanner